শিব্রাম রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ছেলেবেলা বলতে আমার কিছু নেই। কিছুই আমার মনে থাকে না। অল্প বয়সে ছিলুম বুড়ো মানুষ! আর, বুড়ো বয়সে শুরু হয়েছে আমার ছেলেবেলা।

এ ছাড়া আর কি-ই বা বলব?

বিদ্যাসাগরের চেয়ে আমি কমতি ছিলুম না। মাইকেলের সঙ্গেও আমার ছিল মিল। বঙ্কিম চাটুজ্জে ছেলেবেলায় যা করেছেন, আমিও তাই করেছি। সবার সঙ্গেই আমার মিল। রামের সঙ্গেও শ্যামের সঙ্গেও। সবাই যেমন দুষ্টুমি করে, আমিও তেমনি করেছি।

হ্যাঁ। তবে একটা বিষয়ে গরমিল ছিল।

বিদ্যাসাগর যেমন দামোদর পেরিয়েছিলেন, আমি হলে তা পারতুম না! সে কী যে-সে লোকের কম্ম? আরেব্বাস! সে কী ভয়ঙ্কর নদী।

না! ভুল বললুম। দামোদর তো নদী নয়, নদ।

বিদ্যাসাগর ওই দামোদর পেরিয়েছিলেন সাঁতরে। আমি তো সাঁতারই জানতুম না। এখনো জানি না। তবে পুকুরে চান করেছি ছেলেবেলায়। ওই যা ভরসা।

জন্মেছি কলকাতায় ১৯০৩ সালে। কেন জন্মালুম? এখানে তো আমার জন্মাবার কথা ছিল না!

ছিল বৈকি!

আগের কালে বাচ্চারা জন্মাত মামার বাড়িতে। মামার বাড়ি মানেই দিদিমার বাড়ি। দিদিমার বাড়ি মানেই দেদার আদর। মামার আদর, দাদুর আদর, দিদিমার আদর। সে জন্যেই ভেবে চিন্তে জন্ম নিলুম আমি কলকাতায়। মানে, মামার বাড়িতে।

তবে কলকাতার কোনো ইস্কুলে পড়িনি।

ইস্কুলে পড়লে তো পাস করতুম। পাস করলে কলেজে যেতুম। কলেজে পড়লে ডাক্তার হতুম। ডাক্তার হওয়ার ভারী ইচ্ছে ছিল আমার।

কিন্তু তা হইনি।

খবরের কাগজের হকার হলুম। দৈনিক বসুমতী বিক্রি করি। দাম দু পয়সা। কমিশন

পেতুম আধ পয়সা। ওই কাগজে লেখা শুরু করলুম প্রথম।

তখন বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। উনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের করমর্দন করেছিলেন। মিথ্যে বলছি না। ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। আমিও রানি এলিজাবেথের করমর্দন করেছিলুম। কিন্তু সে-কথা ছাপা হয়নি। খবরের কাগজে বেরুলে মজার হত।

এই রে! ভুল হয়ে গেল। মিথ্যে বলার এই এক বিপদ! কোন্‌দিক সামলাই? সর্বদাই ভাবি, কদাচ মিথ্যা কহিব না। তবুও মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

এই এক ফ্যাসাদ!

কত দিকে কত আড়াল করার চেষ্টা। তবু গোপন থাকে না। সত্যি কথাটাই বেরিয়ে পড়ে। তখন আর লজ্জার সীমা থাকে না।

এবার সত্যি কথাই বলছি।

আমি ইস্কুলে পড়েছি। মালদহ জেলার চাঁচল হাই ইস্কুলে। তবে পড়াশোনায় তেমন মন ছিল না। প্রথম কবিতা লিখেছি ওই সময়েই। সেই কালেই সেটা মাসিক ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইস্কুলের এক মাস্টারমশাই ছিলেন সীতানাথ চক্রবর্তী। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। বাংলার মাস্টারমশাইরা বোধহয় ওই রকম হন। আরেকজন মাস্টারমশাই ছিলেন। তিনিও চক্রবর্তী। তিনিও আমাকে খুব ভালোবাসতেন।

ওই ভালোবাসাই আমার কাল হয়েছে। চক্রবর্তীরাই আমার সর্বনাশ করেছেন। আমার মাথায় পোকা ঢুকল তখনই—কোথাও যেতে হবে। কোথায় যাব?

এখনকার ছেলেরা পালিয়ে বোম্বাই যায়। আমি কলকাতায় এলুম। আমার সেই পালিয়ে আসার গল্প বলেছি, একটা বইতে—'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র ভেতর।*

* নিজস্ব প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

[শিবরাম চক্রবর্তী ছোটোদের খুব প্রিয় লেখক। বিশেষ করে হাসির গল্প লেখার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি আর কে আছেন? বড়োদের জন্যও তিনি কিছু কিছু লিখেছেন। এখনও লিখছেন। তাঁর 'ভাগনে যদি ভাগ্যে থাকে', 'কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন', 'মেয়েরা হারাবেই', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' বইগুলি তো খুবই জনপ্রিয়। তোমরা পড়েছ কি? না পড়ে থাকো তো এখনই পড়ে ফেলো।]

পুস্তক পরিচয়

৩রা জুন ১৯৭৫ (আনন্দবাজার পত্রিকা)

চিরমধুর রচনা

পৃথিবীতেকিছু শব্দ আছে, কিছু গন্ধ আছে, কিছু স্বাদ আছে, যা হঠাৎ মনকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারে বহু বছর আগে, অনায়াসে। পেটা ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ, শরৎকালের সন্ধ্যায় শিউলি ফুলের গন্ধ কিংবা আমজড়ানোর স্বাদ হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। কত ভুলে যাওয়া ঘটনা মনে পড়ে যায় স্পষ্ট করে। এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের জীবনেই হয়েছে কোনো-না-কোনো সময়ে। আমার নূতন করে হল 'শিব্রাম রচনাবলী' হাতে পেয়ে। ওই 'শিব্রাম' বানানটাই নূতন, কিন্তু স্মৃতিগুলি বহু পুরাতন।

'পঞ্চাননের অশ্বমেধ', 'শুঁড়ওয়ালা বাবা', 'কালান্তক লালফিতা', 'মন্টুর মাস্টার', 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি', 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি', 'কলকাতার হালচাল' (রামধনুতে যখন বেরোত কাড়াকাড়ি করে পড়ত সবাই) এই সব বই, আমার ধারণা ছিল, ধরাপৃষ্ঠ থেকে উধাও হয়ে গেছে। বইটা হাতে পেয়ে দেখলাম, না, হারায়নি কেউ। প্রথম একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। ছোটোবেলায় যে গল্পগুলি আমাদের এত আনন্দ দিয়েছিল, আবার পড়ব কি? যদি না ভালো লাগে? যদি ছেলেমানুষি মনে হয়? পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়ে দেখলাম, আশঙ্কা মিথ্যা। এ লেখাগুলি চিরভাস্বর চিরমধুর। 'পণ্ডিত বিদায়'-এর সেই মারাত্মক শ্লোক—হবার্ত্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেড়ুয়ে। আণ্ডিলঃ অণ্ডফ্রয়েণ মানষ্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ—এখনো পেটে খিল ধরিয়ে দেয়। 'বিহার-মন্ত্রীর সান্ধ্য বিহার' গল্পে মেসোমশাই এবং পিসেমশাই-এর দুর্দশার গল্প পড়ে শুধু মনে হল, তাঁদের মতো অসৎ ও কর্মবিমুখ ডাক্তার এবং দারোগার এখনো অভাব নেই, তবে হারুন-অল-রশিদের মতো মন্ত্রীরাও উধাও হয়েছেন কালের অমোঘ গতিতে। ডাক্তার পিসের অসুখ সারাবার মোক্ষম দাওয়াই সেদিনও যেমন ছোটোদের আনন্দ দিয়েছিল আজও তেমনি দেবে।

শিবরাম আর ছোটোরা যেন ইংরাজি শব্দের কিউ-এর পর ইউ-এর মতন, একজনকে বাদ দিয়ে অন্যদের ভাবাই যায় না, একেবারে অশাস্ত্রীয় হয়ে যায় এদের ছাড়াছাড়ি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও এ-কথাটা সত্য ছিল, আজও সত্যি। বাংলাদেশে

তো বহু আদমশুমারি হল, একবারও কেউ যদি শিবরামের ভাইপো ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নীর আদমশুমারি নিত, তবে দেখা যেত এত দলে-ভারী কোনো দলই নয়। অন্তত তিনপুরুষ (না হলেও দুপুরুষ তো বটেই) ধরে কোনো কোনো পরিবার শিবরামের ভাগ্নে ভাইঝি। তাদের জগতে সব সত্যি। বিনি সত্যি, হর্ষবর্ধন সত্যি, গোবর্ধন সত্যি, ডালু মাসি আর তার ডালপালাও অতি সত্যি। শিবরামকে যেমন প্রাণ ঢেলে ছেলেমেয়েরা ভালোবাসে এবং বেসেছে শিবরামও তার প্রতিদান দিয়েছেন। যেদিন বাংলা সাহিত্যের মাপকাঠি একমাত্র ঢাউস উপন্যাস লেখার মধ্যে সীমিত ছিল না, সেদিন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবকটি উজ্জ্বল তারকা ছোটোদের জন্যেও কলম ধরেছিলেন। শিবরামও বড়োদের লেখক ছিলেন (তাঁর মস্কো বনাম পন্ডিচেরী মনে আছে?)। প্রবন্ধ লিখতেন, কবিতা লিখতেন। তারপর একদিন ছোটোদের জন্যে কলম ধরলেন। বাঙালির রামগরুড়ের ছানা অপবাদ ঘোচালেন, অবিস্মরণীয় সমস্ত চরিত্র তৈরি হল। কিছু ছেলেমেয়ে শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলতে গিয়ে বিপদে পড়ল কিন্তু শিবরামকে ছাড়ল না। শিবরামও ছোটোদের ছাড়েননি। উনিও ওঁর সতীর্থদের মতো ফিরে যেতে পারতেন বড়োদের মনোরঞ্জনে। লিখতে পারতেন সর্বার্থসাধক বই, যা অনেকক্ষণ ধরে পড়া যায়, চোরের বিরুদ্ধে ইটের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং ট্রেনে বালিশের কাজ করে। কিন্তু শিবরাম তা করেননি। অথচ সহজেই পারতেন। তার বদলে তিনি আমাদের বিনির কাণ্ড-কারখানা থেকে শুরু করে কাউকে যদি বাঘে পায় তো তার কী দশা হয় সেই গল্প শুনিয়েছেন।

আমি তিন দশকের উপর শিবরাম পড়ছি সবসময় সমান ভালো লাগেনি বিরূপ কথাও কানে আসেনি, তা নয়, কিন্তু দেখেছি শিবের মতো ভোলানাথ—রামের মতো প্রজানুরঞ্জক (পাঠকরা তো এক রকমের প্রজাই) এই লেখকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। ভক্ত-সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েছে।

বইয়ের প্রথমে শিবরাম তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন তিনি সার্কাসের ক্লাউনের মতো সব খেলাতেই দক্ষ বটেন, তবে তাঁর আসল দক্ষতা দক্ষযজ্ঞ ভাঙায়। সব খেলায় ক্লাউন পারদর্শী, কিন্তু খেলাটা তার হাসিল হয় না, হাসির হয়ে ওঠে। আর হাসির হলেই তার খেলা হাসিল হয়.....এরপর শিবরামের জিজ্ঞাসা কিন্তু আমি তা পেরেছি কি? শিবরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁরই যোগ্য কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি তো ক্লাউন নন, তিনি রাজ-রাজেশ্বর, হাসির রাজ্যে আনন্দের রাজ্যে তিনি রাজচক্রবর্তী। তাঁর নামেই তাঁর পরিচয়। রচনাবলির প্রথমে প্রশংসাপত্রের তাই কোনোই প্রয়োজন নেই। আমরা রচনাবলির অন্য খণ্ডগুলির প্রতীক্ষায় রইলাম।

—সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ই এপ্রিল ১৯৭৫

আনন্দ পুরস্কার

সাহিত্য সংবাদ

এ বছর সাহিত্যের জন্য আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী এবং শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়। পুরস্কার দুটির পৃথক নাম প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার। প্রত্যেকটির অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

এই পুরস্কার ঘোষণার কয়েক দিন আগে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা। উনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। তারপর বললেন, ও তুমি নাকি! দ্যাখো, আমার স্মৃতিশক্তিটা একেবারে গেছে। বয়েসও তো সাতাশি বছর হল কিনা।

শুনে আমি স্তম্ভিত! শিবরাম চক্রবর্তীর বয়স সাতাশি বছর? সাতাশি বছরের লোক ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ায়? রেস্টুরেন্টে একা ওমলেট খায়? ওঁর বয়েস বিষয়ে আমি প্রতিবাদ জানাতেই উনি বললেন, তা হবে না কেন? মনে করো, আমার জন্ম

যদি হয় আঠারো শো সাতাশি কিংবা ছিয়াশিতে।

জন্মটা কি একটা মনে করার ব্যাপার? ওটা তো একটা পাকাপাকি ঘটনা। শিবরাম চক্রবর্তীর বয়স কেউ জানে না। কারুর কারুর ধারণা সত্তর-বাহাত্তর, আমার ধারণা পঞ্চাশ-বাহান্ন। সদা হাস্যময় একজন মানুষ যিনি সব সময় অপরের প্রশংসা করার

জন্য ব্যগ্র। শিবরাম চক্রবর্তীর মুখে কেউ কোনোদিন পরনিন্দা শুনেছে কি? কোনোদিন সিল্কের জামা ছাড়া অন্য কোনো জামাও তাঁকে পরতে দেখিনি।

শিবরাম চক্রবর্তীর পাঠক তিন প্রজন্মের। তিনি শুধু একজন লেখক নন, তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একটা বিশেষ রকমের বাক-রীতিই শিবরামীয়। চায়ের দোকানে, ট্রামে বাসে আড্ডাখানায় যুবকরা এক বিশেষ ধরনের রসিকতা করলেই অন্য কেউ বলে উঠবে, তুই যে শিবরামের মতো কথা বলছিস রে! একজন লেখকের জীবিতকালেই এ রকম প্রবাদ-প্রসিদ্ধি সারা পৃথিবীতে বিরল।

শিবরাম চক্রবর্তীর আর একটি বড়ো গুণ তিনি অবিরল লিখতে পারেন। সরস রচনা ক্রমাগত লিখে যাওয়ার জন্য অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর নির্মল হৃদয়ের জন্য। এখনো প্রত্যেক সপ্তাহে তিনি একাধিক রচনা লেখেন, এ রকম লিখে যাচ্ছেন বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে, আমার জন্মেরও আগে থেকে।

শিবরাম চক্রবর্তীর এই সম্মান পুরস্কারে আমরা তাঁকে আমাদের প্রবল খুশির কথা জানাই।

—সনাতন পাঠক

শিবরাম চক্রবর্তী শ্রদ্ধাভাজনেষু,

বাংলা সাহিত্যে আপনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান, কল্পনার এক অক্ষয় ভাণ্ডার নিয়ে আপনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন এই শতাব্দীর প্রায় শুরুর দিকে। একদিন যে সব শিশুরা আপনার রচনায় মুগ্ধ হয়েছিল আজ তাদের পুত্র কন্যা এবং পৌত্রীরাও সমানভাবে আপনার সম্পর্কে আকৃষ্ট। তিন পুরুষ ধরে আপনি শিশুদের কাছে রসের কাণ্ডারি। শুধু শিশুদের কাছে নয়। এক সময় আপনি দেশাত্মবোধক রচনাতে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। আপনি লিখেছেন বাস্তবধর্মী নাটক। চিন্তামূলক প্রবন্ধ এবং কাব্য রচনাতেও আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য সব কিছু প্রায় ত্যাগ করে আপনি শিশুদের জন্যই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। বাংলা সাহিত্য আপনার কাছে ঋণী। আপনার সাহিত্যকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এবৎসর প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি পুরস্কার আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমরা গৌরব বোধ করছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা। দেশ। ১৩৮২

লেখকের বক্তব্য

লোকমতে, বালকমতে বলাই উচিত, (কারণ আমার পাঠক-পাঠিকার বেশির ভাগই কিশোর-কিশোরী আমার ধারণায়) আগেকার কালেই আমি নাকি এক-আধটু ভালো লিখেছিলাম?

ভালো কী মন্দ জানিনে, সেকালের লেখা অধুনা দুর্লভ সেই সব দুষ্প্রাপ্য রচনা নানান স্থান থেকে খুঁজে পেতে জোগাড় করে এইভাবে এমন সৌষ্ঠব সুষমায় প্রকাশ করার তাবৎ কৃতিত্ব আমার তরুণ ভাগিনেয় শ্রীমান্ গোপালের।

এই খণ্ড প্রকাশে যে অযথা বিলম্ব ঘটেছে, সেইসঙ্গে যা কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে তার সব দায় আমার বয়সোচিত অক্ষমতায়। সেই সব গলতি নাতিবৃহৎ আমার পাঠকগোষ্ঠী নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন সে ভরসা আমার আছে।

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রকাশকের নিবেদন

মামার সেকালের লেখাগুলি একালে আর পাওয়া যায় না। খুঁজে পেতে জোগাড় করে বার করার জন্যই এই খণ্ড প্রকাশের একটু বিলম্ব হয়ে গেল। পরবর্তী খণ্ডগুলি পরম্পরায় একটু চট্‌পট্ বেরুবে আশা করা যায়। এই খণ্ডে লেখকের তিনটি উপন্যাস আর অনেকগুলি গল্প রয়েছে।

সূচিপত্র

- বাড়ি থেকে পালিয়ে ১৭
- ক্যালেন্ডারের কাণ্ড ৮০
- হাতে হাতে ফল ৮৩
- অঙ্ক আর সাহিত্যের যোগফলে ৮৭
- হলধর আর ইন্দ্রসেন ৯৩
- এক দুর্যোগের রাতে ১০৪
- নরখাদকের কবলে ১০৯
- গুরু চণ্ডালী ১১৭
- কঙ্কে-কাশির কাণ্ড ১২১
- CALL-কারখানা ১৩৪
- পদ্মাপাড়ি ১৩৯
- বাজিরাও — অদ্বিতীয় ১৪২
- জোড়া-ভরতের জীবন-কাহিনী ১৪৬
- ভূমিকা বনাম এজাহার ১৫২
- কে হত্যাকারী ১৫৮
- টিকটিকির ল্যাজের দিক ২০৪
- অবাঞ্ছনীয় উপসংহার ২১১
- আমার ব্যাঘ্র প্রাপ্তি ২১৮
- আমার সম্পাদক শিকার ২২৬
- দশ নম্বর বাড়ির রহস্য ২৩৯
- টুসির মুশকিল ২৪৬
- চূড়ান্তকর গৃহপ্রবেশ ২৬০
- মামার জন্মদিন ২৭২
- ট্যারা চোখের সুবিধা অসুবিধা ২৮০
- বাবার ব্যারাম সোজা নয় ২৮৮
- বাগান বনাম বাগানো ২৯৫
- বাবার চিকিৎসা সোজা নয় ৩০১
- গল্পের উপসংহার ৩১১
- একদা এক কুকুরের পা ভাঙ্গিয়াছিল ৩১৭
- রহস্যময় অট্টালিকা ৩২২
- ছেলেদের কাণ্ড ৪১০
- হাসির ব্যাপার নয় ৪১৬
- মেয়েদের কাণ্ড ৪২৪

বাড়ি থেকে পালিয়ে

এক

বিনোদের সঙ্গে কাঞ্চনের কিছুতেই বনত না। বিনোদ তাদের পুরুতের ছেলে, তাদের ঠাকুর শালগ্রামের পুজো সে-ই করে। বোধ করি দেবতার ভোগের ভাগ নিয়েই তাদের বিরোধের সূত্রপাত হবে।

কাঞ্চনের বয়স তেরো-চোদ্দোর বেশি নয়, কিন্তু সেই বয়সেই তার মতো দুষ্টু—দুর্দান্ত ছেলে পাড়ায় দুটি ছিল না। তার মুহুর্মুহু খিদেও পেত যেমন, তেমনি সেই খিদেকে কাজে লাগাবার উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল তার অসাধারণ। ঘরের যা কিছু খাবার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সে তো আত্মসাৎ করতই, ঠাকুর এবং বিনোদের অংশেও ভাগ বসাতে ছাড়ত না। পুজোর আগে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে যখন তাঁর রাজভোগ থেকে রাজকর সহজেই গ্রহণ করত, তখন পাথরের দেবতা প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতেন না বটে, কিন্তু পুজোর শেষে নিজের অংশ থেকে কিছু ছাড়তে রক্ত-মাংসের মানুষ বিনোদের অত্যন্তই আপত্তি ছিল।

সেদিন স্নান করতে গিয়ে কাঞ্চন এর শোধ নিলে। বিনোদকে সাঁতার কাটতে মাঝ-পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতরে তার মাথা চেপে ধরল। সাঁতার ভালো জানলেও এবং বয়সেও কাঞ্চনের চেয়ে কিছু বড়ো হলেও বিনোদ গায়ের জোরে তাকে আঁটতে পারত না। খানিকক্ষণেই হাঁপিয়ে, একপেট জল খেয়ে বিনোদ যায় আর কি! তখন কাঞ্চন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে— "কেমন জব্দ! আর আমার সঙ্গে লাগবি?"

বিনোদের রাগ ততক্ষণে মাথায় চড়েছে। যতক্ষণ না এককোমর জলে এল, ততক্ষণে সে একটি কথাও বলল না; কিন্তু তীরে পৌঁছেই তার তৈলজীর্ণ ময়লা পৈতেখানি ছিঁড়ে কাঞ্চনকে এই বলে শাপ দিল যে, ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্যি হন, তবে কক্ষনোও তার বিদ্যে হবে না। ফি-বছরই সে পরীক্ষায় ফেল করবে।

এই সুকঠিন অভিশাপে কাঞ্চনের মুখ এতটুকু হয়ে গেল; ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা সে ভাবেনি, তবুও জোর করে বলল—"তোর শাপে আমার কচু হবে!"

এতে বিনোদ কেঁদে ফেললে—"দে, আমার পৈতে খুঁজে দে!"

'এখন কান্না হচ্ছে! ছিঁড়তে গেলি কেন? আমি যাব খুঁজতে—ভা-রী দায় আমার!"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জলের তলা থেকে উদ্ধার করে বিনোদ গিঁট দিয়ে পৈতে পরল।

"ছিঁড়ে গিঁট দিতে গেলি যে বড়ো ? ভা-রী ব্রহ্মণ্যদেব!"

"বাঃ, আমি পৈতে না পরে যাই, আর বাবা আমাকে ধরে ঠ্যাঙান! তুমি তো ওই চাও!"

সেইদিনই।

কাঞ্চনের বাড়ি পুজো সেরে আমবাগানের পথে বিনোদ ফিরছে, কাঞ্চন তাকে ধরল—"দাঁড়াও!" একহাতে ক্ষীরের বাটি, অন্যহাতে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ভীতনেত্রে বিনোদ বলল—"কী আবার?"

কাঞ্চন এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, বলল—"তোমার শাপ কাটান দাও!"

বিনোদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—"দ্যাখ্ কাঞ্চন, শাপ আর কাটান যায় না। ব্রহ্মবাক্য—যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, তা রদ করা ব্রহ্মারও সাধ্যি নয়!

"হ্যাঁ, নয় আবার। আমি এত পড়ে-শুনে ফি-বছর ফেল হতে থাকব, আর তুমি ফাঁকতালে পাস করে মজা লুটবে, সে হচ্ছে না! বল আগে—"

"সে হবার কথা নয় কাঞ্চন, আমি ভেবে দেখলাম। শাপ উল্টে গেছে—শাস্ত্রে এমন কোথাও লেখেনি। তাহলে পরীক্ষিৎ—"

"রেখে দাও তোমার পরীক্ষিৎ! শাপ যদি না কাটান দাও, তবে ওই ক্ষীরের বাটি, আর দইয়ের ভাঁড় দিয়ে যাও!"

বিনোদ এবার গুরুতর সমস্যায় পড়ল। এদিকে শাস্ত্রের নজির, অন্যদিকে ক্ষীরের বাটি। এই উভয়-সঙ্কটে সে মাথা খাটিয়ে বলল—"শাপ তো কাটান যায় না রে! তবে এই বলছি, বিদ্যে তোর না হোক, বুদ্ধি তোর খুব হবে। তাতেই তোর পুষিয়ে যাবে। বুঝলি কাঞ্চন! বামুনের বর, তাও মিথ্যে হবার নয়।"

বিদ্যা ও বুদ্ধির তারতম্য কাঞ্চনের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সে এক ঝট্‌কায় দইয়ের ভাঁড় টেনে নিয়ে সমস্ত দই বিনোদের মাথায় ঢেলে দিল; অবশেষে ক্ষীরের বাটিটা কেড়ে নিয়ে এক আমগাছের ডালে উঠে বসল। বিনোদের দিকে আর দৃকপাত না করে পার দোলাতে দোলাতে যে আপাত মধুর বস্তুটি তার হস্তগত হয়েছিল, সেই বিষয়ে একান্ত মনঃসংযোগ করল।

দুই

বিনোদ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। খানিক পরেই বাড়ির চাকর কাঞ্চনের খোঁজে দেখা দিল—"ছোটোবাবু, বাবা তোমায় ডাকছেন।"

চাপা গলায় কাঞ্চন জিজ্ঞেস করল—"কেন রে?"

"বিনোদ ঠাকুর—"

"কী বলেছে সে, শুনি?"

"তুমি নাকি পুজোর আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরের ভোগ খেয়ে রাখ, তারপরে একদিন নাকি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ঠাকুর-পুজো করতে দাওনি।"

"এই সব বলেছে! পাজি কোথাকার! আচ্ছা, দেখব তাকে আমি—"

"আবার আজ নাকি তুমি তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছ! মাথায় দই ঢেলে—"

"মিথ্যে কথা! আমি পৈতে ছিঁড়েছি! বলুক দিকি সে? ওর ওই ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে বলুক? ও-ই তো আমাকে শাপ দিলে! আর দই ঢেলেছি? বেশ করেছি, কাল ঘোল ঢালব। দেখি কী করে ও!"

"বাবু তোমাকে এক্ষুনি ডাকছেন! মালখানা থেকে সেই রুপো-বাঁধানো চাবুকটাও বের করেছেন।"

"বা রে! সে তো আমার ছড়ি! আমার পিঠেই পড়বে নাকি!"

"তা কী জানি বাবু! এখন তো চল, তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠালেন।"

"দেখছিস না, আমি খাচ্ছি! যা তুই, আমি যাব এখন। —হ্যাঁ রে, মা কোথায় রে?"

"মা কাঁদছেন। তোমাকে আদর দেন বলে বাবা তাঁকে খুব বকেছেন।"

"যা যা, এখন যা! বিরক্ত করিস নে। রাগ হয়ে গেলে এই বাটি তোর মাথায় ছুঁড়ে ভাঙব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

"আমি তো যাচ্ছি, মা-ঠাকরুন আমাকে চুপি-চুপি বলে দিলেন, কর্তাবাবু খেয়েদেয়ে ঘুমোবার আগে তুমি যেন বাড়ি ঢুকো না, বুঝলে?"

"যা যা, তোকে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না।"

চাকর হাসতে হাসতে চলে গেল। কাঞ্চন ভাবতে লাগল, এখন সে কী করে? বিনোদ যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা কি সে কোনোদিন ভেবেছিল? যাই হোক, কাঞ্চন আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল যে, বিনোদ কেমন স্বার্থপর। সামান্য একবাটি ক্ষীরের জন্যে—! নাঃ, আর কক্ষনো সে অমন হিংসুটে ছেলের সঙ্গে মিশবে না। কিন্তু এখন—এখন কী করা?

গাছ থেকে নেমে আমবাগানের পাশ দিয়ে যে বাঁধা রাস্তাটা গেছে, তাই ধরে সে হাঁটতে শুরু করল—যেদিকে দু-চোখ যায়। কতক্ষণ সে চলেছে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না। অবশেষে যেখানে পথ শেষ হল, সেটা এক রেল স্টেশন।

একটু বাদেই একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। কাঞ্চন একটুক্ষণ কী ভাবলে, তারপর লোকজন কম এই রকম একটা কামরা বেছে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি চলেছে। কোথায় যাচ্ছে, কিছুই সে জানে না। কয়েকটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। কত লোক উঠল—নামল; কিন্তু কেউ তাকে একটি প্রশ্নও করল না। অবশেষে একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়াতেই একটি ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করলেন—"খোকা, তুমি নামবে না?"

"এটা কী স্টেশন?"

"বর্ধমান। এ-গাড়ি এখানেই দাঁড়াবে, এরপর আর যাবে না।"

অতএব তাকে নামতে হল। ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন—'কোথায় যাবে তুমি?"

সে একটু ভেবে বলল—"কলকাতায় যান।"

"কিন্তু এ গাড়ি তো সেখানে যাবে না। কলকাতার গাড়ি পরেই আসবে ওই ওধারের প্ল্যাটফর্মে। ওভার-ব্রিজ দিয়ে পেরুবে, লাইন ডিঙিয়ে যেয়ো না যেন—বুঝলে?" বলে ভদ্রলোক মোট-ঘাট নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

"কই হে, তোমার টিকিট কই?"

কাঞ্চন দমবার ছেলে নয়, সহজভাবে উত্তর দিল—"আমি কি আপনাদের গাড়িতে চেপেছি নাকি? আমি তো বেড়াতে এসেছি।"

টিকিট-চেকার বললেন—"স্টেশন হাওয়া খাবার জায়গা নয়।" এই বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন; কাঞ্চনও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন বেলা দুটোর বেশি। তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। সঙ্গে একটিও পয়সা নেই যে, মুড়ি কিনে খায়। কী করবে ভাবতে ভাবতে চলেছে। কিছু দূর যেতেই দ্যাখে, একটা নাদুস-নুদুস ছাগল তাকে গুঁতোতে তাড়া করে আসছে। সে কিছুটা পিছু হটে রাস্তার পাটকেল কুড়িয়ে তাক করে তাকে মারতে যাবে, এমন সময়ে সামনের চালাঘর থেকে একটি ততোধিক মোটাসোটা মেয়েমানুষ শশব্যস্তে বেরিয়ে আর্তকণ্ঠে বললে—"আহা, মেরনি বাবা, মেরনি! বাছা আমার মরে যাবেক।"

"মারছি না; কিন্তু তোমার বাছাকে তুমি সামলাও।"

ছাগলকে নিয়ে যেতেই তার নজর পড়ল সেই ঘরটির দোরের উপর। একটা সাইনবোর্ড সেখানে লট্‌কানো, তাতে বিচিত্র ছাঁদে ও বানানে লেখা—

পবিত্র হিন্দু-হোটেল—হিন্দু ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান

সে স্ত্রীলোকটিকে বললে—"এখনো কি তোমার হোটেলে খাবার-টাবার আছে কিছু?"

"খুব আছে, খাবেক তুমি?"

"নিশ্চয়।"

কাঞ্চন খাওয়া-দাওয়া সেরে বলল—"কত দাম দিতে হবেক?"

"এমন আর কী খাইছ, যা খুশি দাও।"

"তোমরা নাও কত?"

"চৌদ্দ পইসা।"

"আমি তো তার অর্ধেকও খেতে পারিনি—অর্ধেক দেব।"

"তাই দাও।"

মশলা নিয়ে গম্ভীরভাবে চিবুতে চিবুতে কাঞ্চন বলল—"তোমার যা রান্না, আর আমি যা খেয়েছি, তাতে তোমাকে এক পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। আমি কিচ্ছুই দেব না।"

হোটেলওয়ালি হেসে বলল—"আচ্ছা না দিবেক, তো নাই দিবেক।"

মোটা ছাগলটি এসে এবার আদর করে তার হাত চেটে দিল, বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল—"দূর ছাই! ভালো আপদ দেখছি!" তার পরে হাতটা ছাগলেরই লোমশ গায়ে মুছে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্টেশনে ফিরে দেখল, একটা গাড়ি ওধারের প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে। সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাতে উঠে বসল। পাশের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল—"মশাই, এ-গাড়ি যাবে কোথায়?"

তিনি একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"কেন, কলকাতায়।"

কলকাতা তখন আর কয়েকটা স্টেশন পরেই। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ জমে উঠেছিল। কলকাতা কেমন জায়গা! সেখানে সে এই প্রথম যাচ্ছে কিনা! হ্যাঁ, মামার বাড়িই। মামা তাকে নিতে স্টেশনে আসবেন; কিন্তু যদি দৈবাৎ স্টেশনে না আসতে পারেন? তা, তাতে কী হয়েছে, ভদ্রলোক না হয় তাকে মামার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।—এই রকম নানান কথাবার্তা! ভদ্রলোকের মুখে শুনে শুনে কল্পনায় সে কলকাতার ছবি আঁকছিল। কলকাতায় দিনরাত নাকি এক-সমান, রাত্রে চাঁদের আলো পথে পড়তে পায় না। এত আলো রাস্তায়! সব ইলেক্‌ট্রিক! রূপকথার রাজপুরীর মতন বড়ো-বড়ো বাড়ি! আর কত লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, সেপাই-শান্ত্রী—কত কী!

আর দশ মিনিট পরেই তার কত স্বপ্নের—কত সাধের কলকাতা!

কিন্তু একটা ভয় ছিল। সেটা প্রকাশ করে বলতেই ভদ্রলোকটি বললেন, "তাড়াতাড়িতে টিকিট করতে পারনি, তা আর কী হয়েছে? তুমি তো আর ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছ না, আমি আগে বেরিয়ে গিয়ে একটা কিনে এনে দেব, সেইটা দেখালেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।"

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকল। গোলমাল—হৈ চৈ—কুলি চাই? —কত লোক! বিদ্যুতের আলোয় কাঞ্চন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রলোকটি তার হাতে ওভারকোট দিয়ে বললেন—"এইটা ধর। আমি এক্ষুনি ফিরছি।"

তিনি চলে গেলেন। কাঞ্চন দেখলে—ওভারকোটের পকেটে সোনার ঘড়ি-চেন, কাগজ-পত্র, আরো কত কী!

দশমিনিট পরে তিনি ফিরে এসে টিকিটটা কাঞ্চনের হাতে দিলেন। টিকিটখানা নেড়ে চেড়ে কাঞ্চন দেখলে, তাতে লেখা আছে—প্ল্যাটফর্ম টিকিট, চার পয়সা দাম। নিজের শূন্য পকেটে হাত পুরে দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে—"দেখুন—আমার কাছে খুচরো পয়সা তো নেই—"

"আহা থাক। চার পয়সা আর দিতে হবে না। তোমার মামা কই? এসেছেন তিনি?"

"আসবেন নিশ্চয়। দেখি তাঁকে—"

"আমি তবে চললুম, কেমন?"

ভদ্রলোক নিজের পথে চলে গেলেন। কাঞ্চন টিকিটখানা গেটে দিয়ে বাইরে এসে